মানুষকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার কাজে সহায়তা করে।[১]

আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদানসমূহ ঃ

সাহিত্য ঃ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ইতিহাসচিন্তা ও ইতিহাস লেখার সূত্রপাত ভারতে ঘটে ব্রিটিশ আমলে। উনিশ শতকে ভারতীয় ইতিহাসবিদরা বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসা এবং যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ দ্বারা ইতিহাসচর্চার নতুন ধারার সূচনা করেন। এর ফলশ্রুতিতে ভারতে ইতিহাসবিদ্যা ও ইতিহাসচর্চার আবির্ভাব ঘটে। তবে আধুনিক যুগে ভারতে ইতিহাসবিদ্যার আবির্ভাব ঘটলেও প্রাচীনকালে এদেশে ইতিহাসবোধ ও ইতিহাসচর্চা একেবারেই ছিল না কিংবা সেকালে ইতিহাস গ্রন্থ আদৌ রচিত হয়নি—এমন ধারণা সঠিক নয়। *'Hero-lands'* গীতগাথায় ভ্রূণাকারে ইতিহাসমূলক বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক/ খ্রিস্টীয় প্রথম শতক) ইতিহাসের বিষয়বস্তুর ব্যাপক পরিধির উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িক, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদিকে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতিহাস *'পঞ্চম বেদ'* হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় প্রাচীন ভারতে ইতিহাসের ওপর একটা পবিত্রতার ছাপ দেওয়ার ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। ড. ***রমেশচন্দ্র মজুমদার*** মনে করেন, কৌটিল্য কথিত ইতিহাস ধর্মের এক্তিয়ার-বহির্ভূত মানবজীবনের নানা দিককে স্পর্শ করতে দায়বদ্ধ ছিল। ব্যক্তি ও ঘটনা-বিষয়ক ঐতিহ্য, আর্থরাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক তত্ত্ব এবং সেইসব তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ, আইন-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিধিবিধান সবই ইতিহাসের উপজীব্য ছিল।

বর্তমানে *'ইতিহাস'* বলতে বোঝায় বিভিন্ন যুগের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনাসহ কালানুক্রমিক ভিত্তিতে রাজা বা রাজবংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সেই সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক কাঠামো ইতিহাসের অন্যতম প্রধান উপজীব্য হিসেবে স্বীকৃত। প্রাচীন ভারতেও এই বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে সমকালীন লেখকদের সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে পুরাণ গ্রন্থে বর্ণিত 'সূত' ও 'মাধব'দের কর্তব্যকর্মের উল্লেখ করা যায়। *পার্জিটার*-এর মতে, পুরাণে বর্ণিত রাজনৈতিক ইতিহাসের অংশের উপাদান 'সূতগণ' কর্তৃক সংগৃহীত। রাজাদের বংশতালিকা, ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে বীরগাথা 'সূত'রাই সংগ্রহ করতেন। পুরাণপ্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতেই পার্জিটার, প্রাক্-গুপ্ত ভারতের অন্তত কুড়িটি বংশের তুলনামূলক তালিকা প্রস্তুত করেছেন। গুপ্ত রাজাদের আমলে এই ব্যবস্থা কিছুটা নতুন রূপে পালিত হয়। এসময় সরকারি মহাফেজখানায় বংশতালিকা রাখার প্রথা চালু হয়। সমকালীন 'তাম্র লেখ' থেকে এ ধরনের তালিকা সংরক্ষণ ব্যবস্থার কথা জানা যায়। নিঃসন্দেহে পুরাণ গ্রন্থের শিক্ষা থেকেই এই ব্যবস্থার সৃষ্টি।

প্রাচীন ভারতে ইতিহাসের উপজীব্য বিষয়াবলি সম্পর্কে লেখার রীতি চালু থাকলেও আক্ষরিক অর্থে 'ইতিহাসমূলক' গ্রন্থের অভাব সম্পর্কে সংশয় নেই। আবেগাপ্লুত হয়ে এই ঐতিহাসিক তথ্যটিকে অস্বীকার করা যায় না। তবে এই কারণে ঐতিহাসিক সত্য অনুসন্ধানের কাজ হয়তো কিছুটা জটিল হয়েছে, কিন্তু অসম্ভব হয়ে পড়েনি। আদি-মধ্যযুগের ভারতবর্ষ সম্পর্কেও এই কথাটি প্রাসঙ্গিক। গুপ্ত

১. *আর. এস. শর্মা—প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস, ১৯৯৬, পৃ. ২৬০-৬১।*

Scanned by CamScanner

সাম্রাজ্যের পতন থেকে তুর্কি-আফগান্ শাসনের সূচনা কাল (৬৫০-১২০০ খ্রিঃ) পর্যন্ত আদি-মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসমূলক তথ্য বা উপাদান হিসেবে আমরা মূলত সাহিত্যকীর্তির ওপর নির্ভর করি। সমকালীন লেখ ও মুদ্রার সাক্ষ্য দ্বারা সাহিত্য থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলিকে পরিশুদ্ধ করে নেবার চেষ্টা করা হয়। তবে সমকালীন ঘটনার বিবরণ-বিষয়ক নির্ভরযোগ্য নিরপেক্ষ সাহিত্যের অপ্রতুলতা যেমন স্পষ্ট ; তেমনি লেখ বা মুদ্রার পরিমাণও সীমিত।

আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের প্রধান উপাদান হল *'সাহিত্য'*। ইতিহাসের উপাদানে সমৃদ্ধ অনেকগুলি সাহিত্য এযুগে রচিত হয়। এই সকল সাহিত্যকর্মের গুণগত মূল্যমানে অনেক প্রভেদ আছে। তবে এগুলি সকলেই কোনো-না-কোনোভাবে ইতিহাস রচনার কাজে সহায়তা করেছে। সমকালীন তথ্যসমৃদ্ধ অন্যতম গ্রন্থ হল *বাণভট্ট* রচিত ***হর্ষচরিত***। গ্রন্থটি মূলত গদ্যে রচিত। অবশিষ্ট অংশ পদ্যে রচিত। বাণভট্ট তাঁর এই গ্রন্থে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের প্রথম কয়েক মাসের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতাধন্য বাণভট্ট তাঁর লেখনীতে ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতা দেখাতে পারেননি। তিনি অযৌক্তিকভাবে হর্ষবর্ধনকে একজন পরাক্রমশালী ও প্রজাদরদী শাসক হিসেবে চিত্রিত করেছেন। ড. ***রমেশচন্দ্র মজুমদারের*** মতে, *'হর্ষচরিত'* গ্রন্থে ঐতিহাসিক গুরুত্বসমৃদ্ধ বিবরণী বারো পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ ***বিলহন*** দাক্ষিণাত্যের চালুক্যবংশীয় রাজা ***ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের*** সভাকবি ছিলেন। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের কর্মকাহিনী স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে তিনি ***বিক্রমাঙ্কদেব চরিত*** গ্রন্থ রচনা করেন। বিক্রমাদিত্যের পূর্বসূরি প্রথম ও দ্বিতীয় সোমেশ্বরের রাজত্বকালের কিছু তথ্যও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। একাদশ শতকের আট-এর দশকে রচিত এই গ্রন্থ দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তথ্যের সূত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। অনুরূপ আর একটি ইতিহাসমূলক গ্রন্থ হল *সন্ধ্যাকর নন্দী* রচিত ***রামচরিত***। বাংলার পালবংশীয় শাসক রামপাল-এর কীর্তিকাহিনি এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। সমকালের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা কৈবর্ত বিদ্রোহের বিবরণ এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। বাণভট্টের মতোই সন্ধ্যাকর তাঁর রচনায় রাজা রামপালের প্রতি অকারণ পক্ষপাত দেখিয়েছেন। তবে এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হল এটি দ্ব্যর্থবোধক। এটি এক অর্থে রাজা রামপালের গৌরবগাথা ; আবার অন্য অর্থে অযোধ্যাপতি রাজা রামচন্দ্রের বিবরণ। ফলে ইতিহাসের উপাদানের তুলনায় শ্লোক-কাব্য হিসেবেই এটি বেশি সার্থক। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে বাক্‌পতিরাজ প্রাকৃত ভাষায় রচনা করেন ***গৌড়বহ*** (গৌড় বধ) কাব্য। এই গ্রন্থে কনৌজ রাজা যশোবর্মনের বঙ্গবিজয় সম্পর্কে এক কল্পনামিশ্রিত আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। চালুক্যবংশ-সম্পর্কিত আর একটি গ্রন্থ হল ***কুমারপালচরিত***। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে বিখ্যাত জৈন কবি *আচার্য জয়সিংহ* এটি রচনা করেন। পালি ভাষায় রচিত এই গ্রন্থে চালুক্যবংশীয় নৃপতি কুমারপালের কাহিনি বর্ণিত রয়েছে। ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে *পদ্মগুপ্ত* রচনা করেন আর একটি রাজপ্রশস্তিমূলক গ্রন্থ ***নবশশাঙ্কচরিত***। এটি গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিবরণ নয়, এই গ্রন্থের কেন্দ্রে আছেন গুর্জরবংশীয় জনৈক সিন্ধু রাজা। ইনি ***নবশশাঙ্ক*** নামেই অভিহিত হতেন।

স্মরণীয় যে, এই জীবনচরিতগুলির ইতিহাসগত মূল্য খুবই সীমিত। এদের রচনাশৈলীও যথেষ্ট উন্নত ও ভারসাম্যপূর্ণ নয়। ভাষাও সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার ঊর্ধ্বে। ভাষা, অলংকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে যেমন কৃত্রিমতার প্রাধান্য দেখা যায় ; তেমনি বিষয়বস্তু বর্ণনার ক্ষেত্রে বাস্তবের পরিবর্তে পৃষ্ঠপোষক-রাজন্যবর্গের মনোরঞ্জনের দিকেই লেখকদের ঝোঁক ছিল বেশি। স্বভাবতই, ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এদের সাক্ষ্য গ্রহণ করার বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যিক।

আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে স্থানীয় ইতিবৃত্তগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সবথেকে উল্লেখযোগ্য রচনাটি হল কাশ্মীরি ঐতিহাসিক *কলহন*-এর ***রাজতরঙ্গিনী***। গ্রন্থটির রচনাকাল

Scanned by CamScanner

আনুমানিক ১১৪৯-'৫০ খ্রিস্টাব্দ। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যগুলির মধ্যে একমাত্র রাজতরঙ্গিনীকেই ইতিহাস-গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া হয়। *এ. এল. ব্যাসামের* মতে, *"প্রচলিত সংস্কৃত সাহিত্যাবলির মধ্যে কেবল এই গ্রন্থ (রাজতরঙ্গিনী)-টিই প্রকৃত ইতিহাস রচনার প্রয়াস হিসেবে সুন্দর"* (*"The book is unique as the only attempt at the true history in the whole of surviving Sanskrit literature."*)। কাব্যছন্দে রচিত এই গ্রন্থে কলহন ঐতিহাসিকের নির্মোহ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পূর্বাপর ঘটনার বিশ্লেষণ করেছেন। *'রাজতরঙ্গিনী'* রচনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন গ্রন্থে বিধৃত কাশ্মীরের খণ্ডিত ইতিহাসকে একটি সুসংবদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া। এজন্য তিনি রাজাদের সমকালীন লেখকদের রচনাবলি থেকে প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। কাশ্মীরের স্থানীয় পুরাণ গ্রন্থ *নীলামত পুরাণ* থেকেও তিনি রসদ সংগ্রহ করেন। তবে বিচারবিশ্লেষণ ছাড়া তিনি কোনো তথ্য গ্রহণ করেননি। বিভিন্ন পত্রলেখ এবং ধর্মস্থানকে উৎসর্গী-সংক্রান্ত দলিল-পত্রের সাক্ষ্য দ্বারা সাহিত্যসূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে যাচাই করেছেন। তাঁর কৃতিত্ব এই যে, তিনি কাশ্মীরের রাজাদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। তবে তথ্যের অভাবের কারণে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের পূর্ববর্তী ইতিহাস সমানভাবে নির্ভরযোগ্য হয়নি। স্থানীয় ইতিবৃত্ত হিসেবে গুজরাট-সম্পর্কিত রচনাগুলিও উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। সোমেশ্বর রচিত ***রসমালা*** ও ***কীর্তিকৌমুদি***, বালচন্দ্র লিখিত ***বসন্ত বিলাস*** গুজরাট-সম্পর্কিত বহু তথ্য সরবরাহ করে। ইতিহাসের সমগোত্রীয় ছিল কিছু প্রবন্ধ সংকলন। ১৩০৬ খ্রিস্টাব্দে জৈন মেরুভুঙ্গ রচিত ***প্রবন্ধ চিন্তামনি*** এমনই একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

গুপ্তদের আমল থেকে সরকারি মহাফেজখানায় বংশতালিকা রাখার ব্যবস্থা হলেও, সূত্রগণ তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে বংশতালিকা রচনার কাজ চালিয়ে যেতেন। নেপালি বংশাবলি, বাংলার কুলজি গ্রন্থ, আসামের বুরঞ্জি প্রভৃতি একই ধরনের ঘটনাপঞ্জি হিসেবে ইতিহাসের সূত্র নির্দেশ করে। সিন্ধুদেশের অনুরূপ ঘটনাপঞ্জি থেকে সংগৃহীত তথ্য নিয়েই ***চাচ্‌নামা*** রচিত হয়েছে। এমনকি কলহন্‌ও কাশ্মীর-বিষয়ক ঘটনাপঞ্জি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাজবংশের উত্থান-পতন, পরিবর্তন, সংঘাত ইত্যাদি কারণে সরকারি মহাফেজখানায় রক্ষিত বংশতালিকা প্রায়ই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিত। কিন্তু সূত্রগণের ঘটনাপঞ্জি সংরক্ষণের প্রয়াস অব্যাহত থাকত। হর্ষচরিত, রাজতরঙ্গিনী প্রভৃতি ইতিহাসমূলক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে লেখকরাই এইসব ঘটনাপঞ্জির সাক্ষ্য উল্লেখ করেছেন।

আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে বিদেশি পর্যটক ও পণ্ডিতদের রচনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে চৈনিক ও আরবীয় পর্যটকদের অবদান সর্বাধিক। চৈনিক পরিব্রাজকদের মধ্যে ***হিউয়েন সাঙ্‌***-এর নাম সর্বাগ্রগণ্য। ৬৩০ থেকে ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতে অবস্থান করেন এবং বুদ্ধদেবের স্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলি পরিভ্রমণ করেন। থানেশ্বরের শাসক হর্ষবর্ধনের আতিথেয়তা লাভ করে তিনি বৌদ্ধদর্শন ও সমকালীন ভারতের জীবনধারা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ভারত পর্যটনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি লেখেন ***সি-ইউ-কি*** (Si-yu-ki) গ্রন্থটি। তাঁর জীবনীকার হুই-লি'র রচনা থেকে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু জানা যায়। সি-ইউ-কি বা 'পশ্চিমিদেশের স্মৃতি' গ্রন্থে তিনি ভারতের সম্যক, অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। হিউয়েন সাঙ্‌-এর রচনাটিও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। তথাপি সমকালীন ভারতের জীবনধারা সম্পর্কে তথ্য আহরণের সূত্র হিসেবে এটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। আর এক চৈনিক পরিব্রাজক **ই-সিং** (I-tsing) সপ্তম শতকের শেষদিকে (৬৭১ খ্রিঃ-৬৯৫ খ্রিঃ) ভারতে আসেন এবং সমকালের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচনার ভিত্তিতে সংস্কৃত সাহিত্যের রচনাকাল স্থির করা সম্ভব হয়।

Scanned by CamScanner

চৈনিক পর্যটকদের বিবরণীর মতো ব্যাপকাকার না-হলেও, আরবীয় পর্যটকদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী আদি-মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান হিসেবে স্মরণীয়। আরব বণিক সুলেমান নবম শতকে (৮৫১ খ্রিঃ) ভারতে আসেন। পালবংশীয় রাজা দেবপালের সাম্রাজ্য পরিভ্রমণ করে তিনি একটি বিবরণী প্রস্তুত করেন। এই বিবরণী থেকে পাল রাজাদের সুবিশাল সেনাবাহিনী এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের জন্য প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের সাথে পাল রাজাদের সংঘর্ষের বিষয় জানা যায়। বাগদাদের অধিবাসী *আল-মাসুদি* ৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসেন। প্রতিহাররাজ মহীপালের পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর বিবরণ তাঁর রচনা থেকে জানা যায়। তিনি প্রতিহার রাজ্যকে *'অল-জুজ্‌র'* (Al-Juzr) নামে অভিহিত করেছেন। আল-মাসুদির বিবরণ থেকে প্রতিহার রাজ্যের শক্তিশালী সেনাবাহিনী এবং কর্তৃত্ব দখলের জন্য বাংলার পাল রাজা ও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজাদের অবিরাম সংঘর্ষের কথা জানা যায়। এ ধরনের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল আরব পণ্ডিত *আলবেরুণী* রচিত ***তহকক্-ই-হিন্দ্*** (হিন্দুস্তান অনুসন্ধান)। মধ্য-এশিয়ার খারিজম রাজ্যের রাজধানী খিবাতে ৯৭০ খ্রিস্টাব্দে আলবেরুণীর জন্ম হয়। তাঁর আদি নাম আবু রায়হান। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে গজনির সুলতান মামুদ তাঁকে সভাসদ হিসেবে গজনিতে আনেন। ১০৩০ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে গজনির সুলতান মামুদের সাথে তিনি ভারতে আসেন। আরবি ও ফারসিতে দক্ষ এই পণ্ডিত ভারতের দর্শন, গণিতশাস্ত্র, ভেষজবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হন। *'তহকক্-ই-হিন্দ'* গ্রন্থে তিনি তাঁর ভারত- সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। অবশ্য ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি প্রায় নীরব থেকেছেন। তবে ভারতের সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি ভারতীয়দের শিক্ষানুরাগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর ভারতীয় পণ্ডিতদের দক্ষতার কথা এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। একইসাথে তৎকালীন হিন্দু সমাজের অবক্ষয়ের দিকটিও তিনি তুলে ধরেন। নতুন ভাবধারা গ্রহণ তথা বহির্জগতের পরিবর্তনের সাথে নিজেদের সমন্বয় ঘটানোর কাজে ভারতীয়দের অনীহা ও অক্ষমতার তিনি নিন্দা করেছেন। ***আলবেরুণীর*** মতে, *"এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও সংকীর্ণতার ফলেই মুসলমান আক্রমণের সামনে হিন্দুরা ধূলিকণার মতো উড়ে গিয়েছিল।"* (*"....the Hindus became like atoms of dust and scattered in all directions."*)। এমনই আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল আরবি ভাষায় রচিত ***চাচনামা।*** চাচ্ লিখিত এই গ্রন্থ নাসিরুদ্দিন কুবাচার আমলে মহম্মদ-আলি-বিন্-আবুবকর কুফি এটিকে ফারসিতে অনুবাদ করেন। আরবদের সিন্ধুবিজয়ের পূর্বাপর ঘটনাবলি এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। মহম্মদ-বিন্-কাশিম কর্তৃক সিন্ধু অভিযানের প্রাক্কালে সিন্ধুদেশের রাজনৈতিক অবস্থা এবং আরব আক্রমণের পরে সিন্ধু অঞ্চলের আর্থরাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নানা তথ্যে চাচ্‌নামা সমৃদ্ধ।

■ প্রত্নতত্ত্ব ঃ

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সূত্র হিসেবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান যেমন গুরুত্বপূর্ণ ; আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও সেকথা প্রযোজ্য। কারণ সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকীয় ভারত-ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সাহিত্যসূত্র সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য হতে পারেনি। আবার সরকারি স্তরে দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণের প্রথাও তখন গড়ে উঠেনি। স্বভাবতই প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্য ইতিহাস রচনার কাজে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসেবে কাজ করে। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল সমকালের অসংখ্য লেখ। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের লেখই সমকালের ইতিহাসের সূত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে। লেখগুলির মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ লেখগুলি হল প্রতিহার-রাজ মিহিরভোজের

Scanned by CamScanner

'*গোয়ালিয়র প্রশস্তি*', ধর্মপালের '*খালিমপুর লেখ*', নারায়ণ পালের '*ভাগলপুর লেখ*', দেবপালের আমল-সম্পর্কিত '*মুঙ্গের লেখ*' ও '*বাদল-প্রশস্তি*', উমাপতি ধর রচিত বিজয় সেনের '*দেওপাড়া লেখ*' চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর '*আইহোল লেখ*' ইত্যাদি। লেখর ওপর ভিত্তি করেই চোলদের আমলে প্রচলিত গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থার স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা যায়। এ প্রসঙ্গে দশম শতকে রচিত (৯২১ খ্রিঃ) উত্তর-মেরু গ্রামের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিটির নাম উল্লেখ্য। অতিসম্প্রতি (মার্চ ১৯৮৭ খ্রিঃ) মালদহ জেলার জগজ্জীবনপুরে আবিষ্কৃত তাম্র শাসনটি ইতিহাসের নতুন সূত্র প্রদান করে ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। এই তাম্র লেখটি আবিষ্কারের পর এমন ধারণার জন্ম হয়েছে যে, রাজা দেবপালের পর প্রথম বিগ্রহ পাল সিংহাসনে বসেননি। দেবপালের অব্যবহিত পরেই সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র জনৈক মহেন্দ্রপালদেব। এই তাম্র শাসনে বৌদ্ধদের ভূমিদান সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ অনুগত ছিলেন।

সরকারি লেখগুলি অধিকাংশই ভূমিদান-সম্পর্কিত। জমি বিক্রি বা জমিদান-সংক্রান্ত নানা বিষয় এতে উল্লেখ করা আছে। এদের প্রথম অংশটি প্রশস্তিমূলক। এই অংশে রাজার নাম, বংশপরিচয়, রাজ্যের আয়তন ইত্যাদির বিবরণ থাকে। ভূমিদান অংশে দানকৃত জমির পরিমাপ, রাজস্ব-মূল্য ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে। সরকারি লেখর তুলনায় বেসরকারি লেখর সংখ্যা অনেক বেশি। গুপ্ত-পরবর্তী যুগের বেসরকারি লেখগুলি প্রধানত সংস্কৃত ভাষায় লেখা এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিষয়ক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রাক্-গুপ্ত বেসরকারি লেখগুলির মাধ্যম ছিল প্রাকৃত ভাষা এবং তার কেন্দ্রে ছিল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম। যাই হোক, বেসরকারি লেখগুলির প্রচারক ছিলেন মূলত উচ্চ সরকারি পদাধিকারী ব্যক্তিগণ। এগুলির বিষয়বস্তু মুখ্যত ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে 'ব্রহ্মদেয় দান' কিংবা মন্দিরের উদ্দেশ্যে 'দেবদান'-সম্পর্কিত। তবে উচ্চপদাধিকারীদের বংশপরিচয়, সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মচেতনা ইত্যাদি বিষয়ে ইতিহাসমূলক তথ্য অর্জনে এগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে মুদ্রার গুরুত্ব অকিঞ্চিৎকর। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর মুদ্রার গুরুত্ব হ্রাস পায়। সম্ভবত, এ সময় মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস পেয়েছিল। পাল, প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট রাজারা খুব কম মুদ্রার প্রচলন করেন কিংবা আদৌ করেননি। সপ্তম শতকের পর থেকে একাদশ শতকের মধ্যবর্তী কালে অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত সমতট-হরিবেল অঞ্চলে কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে পোড়ামাটির জিনিসপত্র, বুদ্ধমূর্তি, মন্দিরের অবশেষ ইত্যাদি কিছু কিছু পাওয়া যায়, যা সমকালের ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ, অজয় নদীর তীরে গড়ে-ওঠা 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' ইত্যাদি আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের সূত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

Scanned by CamScanner